এ কেমন চলে যাওয়া
ড. সৈয়দ মাহবুবুর রহমান স্মরণে

প্রফেসর দিলরুবা জলিল শাহিন

যার কথা লিখছি তিনি আমাদের অতি আপনজন, অনেক কাছের মানুষ ছোটমামা। আমাদের প্রাণের বন্ধু, যার অকস্মাৎ মৃত্যুসংবাদ শুনে মনে হয়েছিল বুকের পাঁজরের একটা হাড় ভেঙে গেছে। তাকে নিয়ে শৈশব থেকে ২০২১ পর্যন্ত কত ঘটনা কত স্মৃতি। দেখা হলে একসাথে বসে এসব স্মৃতিচারণ করেছি। মধুর সময় কাটিয়েছি। স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি আজ তাকে চিরতরে হারিয়ে তার অবর্তমানে এসব স্মৃতিকথা লিখতে হবে, চোখের জলে গভীর শোকে। তার বিশাল সফল কর্মময় জীবন নিয়ে আমি লিখছি না। আমার চোখের সামনে আছে সেই মানুষটা, আমাদের কালে-সময়ে আমরা একসাথে বেড়ে উঠেছি আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ ভাগাভাগি করে ভালবাসাপূর্ণ এক পারিবারিক পরিমণ্ডলে।

আমি, আমার আপু (শিরিন) আর ছোটমামা কাছাকাছি বয়সের ছিলাম বলে আমাদের নিজস্ব একটা টিম গড়ে উঠেছিল – স্কুলে পড়া বয়স থেকেই। সে গ্রুপের নীরব টিমলিডার ছিল সদা হাস্যময়, ধৈর্যশীল, সহজ-সরল, সাদামাটা জীবনযাপন করা, অত্যন্ত মেধাবী বন্ধু মাহবুব মামা। শিশুসুলভ সারল্য, পরহিতৈষী মনোভাব তার স্বভাবের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রয়োজনে বড় ভাই সুলভ শাসন করতো সুকৌশলে। বিশেষ করে পড়াশোনার ক্ষেত্রে। চমৎকার ছবি আঁকত। মানুষ, প্রকৃতি, জীবজন্তু আশেপাশে যা দেখত একটানে এঁকে ফেলত। ছোটবেলায় তাকে এক এক সময় যাদুকর মনে হত।

আমরা দুইবোন পড়ালেখায় খুব একটা খারাপ ছিলাম না। কিন্তু মামার যে বিষয় বুঝতে মুহূর্তমাত্র সময় লাগতো, আমাদের তাতে একটু বেশিসময় লেগে যেত। তার কিছু কারণ ছিল। মন পড়ে থাকতো সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা, খেলাধুলা, আড্ডায়। মামা তাতেও আমাদের সাথে তাল মিলাতো। দেখা যেতো সেখানেও তাকে ঠেকানো যেতো না। সব কাজেই ছিল সেরার সেরা। প্রথম স্থানটি যেন তার জন্য নির্ধারিত ছিল। অথচ নির্লিপ্ত

গোবেচারা ভাব নিয়ে থাকত – যেন কিছুই জানেনা। তার বক্তব্য ছিল জীবনে সবকিছুরই প্রয়োজন আছে কিন্তু পড়াশোনা বাদ দিয়ে না। একে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পড়ার কোন বিকল্প নেই। তাই সব কাজের প্রশ্রয় দিলেও পড়ার ব্যাপারে ছিল তার তীক্ষ্ণ নজর। সে কারণে আমাদের ভিতটা বেশ মজবুতভাবে গড়ে উঠেছিল তার সান্নিধ্যে থেকে। আমাদের রেজাল্ট ভালো হলে তার আনন্দ আর দেখে কে!

আজ মনে হয় তার পাঠশালার আমরা ছিলাম প্রথম ছাত্র, যাদের মনের সুখে গড়েপিঠে নিয়েছিল। পরে প্রফেসর হয়ে যে টেকনিক প্রয়োগ করতো – তার হাতে খড়ি হয়েছিল আমাদের দিয়েই। আমরা এমন বন্ধু শিক্ষক পেয়ে গর্ববোধ করি। যদিও মেধায় তার ধারেকাছে যাওয়াও সম্ভব ছিলনা, তবে বখে তো যাইনি। আমাদের যা কিছু অর্জন তা মামাদের কাছ থেকেই।

তার বড় বৈশিষ্ট্য ছিল বৃদ্ধ থেকে শিশু বয়সের সবার সঙ্গে তাদের মত করে একাত্ম হয়ে মিশে যাওয়া। তাই সব মহলে ছিল তার সমান জনপ্রিয়তা। ছিলনা কোন অহংবোধ, নিজেকে প্রচার প্রবণতা কিংবা যোগ্যতার দম্ভ। রক্তে কোনো রাগ ছিল না মনে হয়। কখনো রাগ করে কথা বলতে দেখিনি। মুখের হাসিটা লেগেই থাকতো তাই রাগ করেছে কি না কষ্ট পেয়েছে কি না বোঝে কার সাধ্য। কিন্তু আকাশে চাঁদ উঠলে তার আলো ঢেকে রাখা যায়না, চতুর্দিকে আপনরূপে প্রতিভাত হবেই। নিজের চাইতে অন্যের জন্য ভাবা, তাদের সুযোগসুবিধা দেখার দায় যেন তারই ছিল। শেষবয়স পর্যন্ত তার নড়চড় হতে দেখিনি।

একবার হাতিরপুলে নানীর বাড়ী কদিনের জন্য বেড়াতে গেছি আমি আর আপু। সুযোগের অপেক্ষায় থাকতাম কখন স্কুল ছুটি হবে আর ছোটমামার সাথে মজা করে সময় কাটাব। সেবার বর্ষায় হাতিরপুলের কাছের পুকুর বেশ পানিতে পরিপূর্ণ ছিল। তখনকার হাতিরপুলের চিত্র একেবারে অন্যরকম ছিল। মেজোমামা বন্ধুদের নিয়ে গোসল করতে যাবেন। আমরা তিনজন বায়না ধরলাম, আমরাও যাব। মেজোমামা শর্ত দিলেন, “নিতে পারি একশর্তে, তোমরা কেউ পানিতে নামবে না”। রাজি হলাম। আমরা একটু দূরে বসে ছিলাম। তিনজনের কেউ সাঁতার জানিনা। হঠাৎ আমার কি হল, একটু পানি ছুঁয়ে দেখার

সাধ হল। আপুও সাথে গেল। হঠাৎ পা পিছলে আমি পানিতে। মনে হচ্ছে হাওয়ায় ভাসছি। পায়ে তলা খুঁজে পাচ্ছিনা; আপুও আমার হাত ধরা, সেও পড়ে গিয়ে একই অবস্থা। এই দেখে ছোটমামা লাফ দিয়ে দুজনকে বাঁচাতে গেল। সাঁতার নিজেও জানেনা। কিন্তু নিজের জানের পরোয়া না করে চিৎকার করে নেমে আমাদের উদ্ধার করতে গেলো। ভাগ্যিস মেজোমামা দেখে ফেলেছিলেন। তাই সে যাত্রা রক্ষা। নাহয় সেদিনই তিনজনের সলিল-সমাধি হয়ে যেত। পরে অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই মামা দক্ষ সাঁতারু হয়ে গিয়েছিল। এভাবে, হয় আমরা হাতিরপুলের বাসায় অথবা ছোটমামা আমাদের বাসায়, আমাদের শৈশবের অনেক ঘটনার জন্ম হয়েছে। শিরিন-শাহিন ছাড়া তারও ভালো লাগতোনা। মন পোড়ে, বড় মন পোড়ে মামার জন্য। কোথায় হারিয়ে গেল। একা থাকলে কেমন ছটফট করতো – সেই একাই এখন কোথায় কীভাবে আছে – আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারে না।

নিজের কোন সমস্যা, কষ্ট, অসুস্থতার কথা বলে কাউকে বিব্রত করতে চাইত না। অথচ অন্যের যে কোন কাজে, প্রয়োজনে, সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ত সবার আগে। মামার ইঞ্জেকশন, কাঁটা-ছেঁড়া-রক্তে ভীতি ছিল। একারণে ব্যথা, যন্ত্রনা সহ্য করতো কিন্তু পারতপক্ষে ডাক্তারের কাছে যেতে চাইত না। একবার আমার ছোটভাই এর (বর্তমান বিচারপতি রাজিক আল জলিল) সুন্নতে খাতনা দেবার জন্য ডাক্তারের কাছে নেয়া হল। আব্বা, বড়মামা, মেজোমামার সাথে ভয় পেলেও নিজ দায়িত্ব মনে করে অনেকটা জোর করেই গেল। কাটাকাটি চলছে। হঠাৎ দেখা গেল ছোটমামা কোথাও নেই। পরে তাকে আবিষ্কার করা হল পাশের একটা চেয়ারের তলায় অজ্ঞান অবস্থায়।

আমার আম্মারা চার ভাইবোন। আম্মার ছোট তিন ভাই। ভাইবোনের মধ্যে এমন আত্মিক বন্ধন আমি কমই দেখেছি। একজন আর একজনকে যেন বুক দিয়ে আগলে রাখতো। আজীবন এমনই মায়া-মমতা ছিল তাদের মধ্যে। আমাদের মধ্যে এ ধারা প্রবাহিত হয়েছে। তাই ডালপালা বিস্তার করলেও আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক আরো দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে।

আমার নানী সত্যি একজন সার্থক রত্নগর্ভা জননী। মা-ছেলের মধুর সম্পর্ক উপভোগ করার মত ছিল। ছোট ছেলে বড় হলেও মায়ের কাছে কোলের শিশুই রয়ে যায়। মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজে চলে গেলে, শুধু ভ্যাকেশনে আসা হতো। তখন মায়ের আক্ষেপ – "ছেলেটা রোগা হয়ে গেছে, ঠিকমত যত্ন হচ্ছে না" – আরও কত কি। মায়ের কষ্ট হবে ভেবে কোন কাজ করতে গেলে হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মামা নিজেই করতে চাইতো। গোসলের দৃশ্য ছিল দেখার মত। মা ছেলেকে ঝামা দিয়ে ঘসে গোসল করাতে চাইতেন, আর ছেলে জোর করে মাকে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিয়ে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতো। মা বের হলেই ভেজা কাপড় ধোয়ার জন্য টানাটানি – নিজ হাতে কাপড় ধুয়ে আয়রন করে দেবে। নানী খুব পরিচ্ছন্ন পরিপাটি থাকতেন, একটু শুচিবাইও ছিলেন। নিজের কাপড় নিজের হাতে না ধুলে তার শান্তি নেই। নানী কি ছেলেকে আর সে সুযোগ দেবেন। খাবার সময়টা ছিল আরো উপভোগ্য। নানী ছেলের পাতে মাছ বা মাংসের বড় অংশ তুলে দেওয়ার সাথে সাথে মায়ের প্লেটে পাচার হয়ে যেত। এই আদান-প্রদান চলতো বহুক্ষণ ধরে। ক্ষুধার যেত বারোটা বেজে। আমাদের বাসায় এলেও একই আচরণ করতো আম্মার সাথে। বড়ো আপার কাজ করতে কষ্ট হচ্ছে চিন্তা করে হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সাহায্য করতে চাইতো। পারুক আর না পারুক। আদরের ছোট ভাই এর জন্য আপা স্পেশাল কোনো রান্নার আইটেম বা আয়োজন করবে এটা মামার কাছে অনর্থক কষ্ট মনে হতো। তাই অস্থির হয়ে যেত। অথচ এতে অপরপক্ষের যে কত সুখ সেটা তাকে কে বোঝাবে।

বড় হবার পরও সেই একই ঘটনা, স্বভাব একটুও বদলায়নি। সবাই মিলে টেবিলে বসলে নিজের প্লেটে খাবার নেবার চেয়ে অন্য সবার প্লেটে খাবার আছে কি-না নিশ্চিত হতো আগে। আমাদের পরের প্রজন্মও এসব ঘটনার সাক্ষী। ওরা বেশ এনজয় করে। দেখে দেখে ওদেরও মুখস্ত হয়ে গেছে। তাই মজা দেখার জন্য উনার প্লেটে খাবার দেয়। মুহূর্তে তা আশে-পাশে পাস হয়ে যায়। দেখে ওদের সে-কি হাসাহসি। মামা কিন্তু নির্বিকার। তার কাজ সে করেই যাবে। খাবার টেবিলে মামা যেন ছোটদের বিনোদন আর রসের খোরাক। খেতে বসে না না করা তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পরে বড়দের হস্তক্ষেপে তাকে বাধ্য হয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কিছু খেতে হতো।

ঝাঁকে-ঝাঁকে স্মৃতি; শত-সহস্র স্মৃতি রেখে গেছে মামা। কেউ তা খেতে পারবে না- উইপোকাও না। উইপোকা অনেক কিছু খায়, কিন্তু স্মৃতি খেতে পারে না। মামার সাথে কাটানো মুহূর্তগুলো তারার মত জ্বলজ্বল করবে।

কিছু মানুষের জন্ম হয় বুঝি শুধু দেবার জন্য। তার চরিত্র-স্বভাব-কর্মকাণ্ড-সৃষ্টি তাকে মহিমান্বিত করেছে। নাহয় মৃত্যুর পর এতো মানুষের ভালবাসা, সম্মান পাবার সৌভাগ্য কজনের হয়। মামার নিজের এত মূল্যবান সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কখনও জাহির না করে বরং মানুষকে খুব সম্মান দিতো। কারো মনে কষ্ট দেয়া, পরশ্রীকাতরতা, হিংসাত্মক প্রতিযোগিতা ছিল তার স্বভাব বিরুদ্ধ।

ছোট মামা কোন্ কাজে পারদর্শী ছিলনা, তাই ভাবি। যে কোন খেলায় ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, ক্যারাম, দাবা। ক্যারামে হাত দিলে এক চান্সে রেডসহ সব গুটি ফেলে দিত। প্রথমে একটু বরিক পাউডার দিয়ে হাতের আঙ্গুল পকেট বরাবর নিশানা করে টপাটপ গুটি পকেটে স্থানান্তর। আমাদের হাতে ধরে ধরে কতদিন শিখিয়েছে, কিন্তু কই, গুটি চলে যায় অন্যদিকে। দাবা খেলা জমে উঠতে না উঠতে রাজা উজির চেক, খেলা মাত। দাবার চালও আমাদের কম ধৈর্য ধরে শিখায়নি। মামা আমাদের সাথে খেলতে গেলে অবশ্য আমাদের কান্না কান্না মুখ দেখে সুযোগ দিয়ে খেলতো। অনেক সময় হারার অভিনয় করতো। আমাদের আনন্দ দেখে যেন মামার তৃপ্তি।

কিশোরসুলভ কৌতূহলে আমরা প্ল্যানচেট খেলতে আহবান করলে আমাদের খুশী করার জন্য তাতেও অংশ নিত। বিখ্যাত ব্যক্তি বা চেনা জানা আত্মাকে ডেকে এনে তার সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বে ভবিষ্যৎ জানার চেষ্টা। আমাদের ধারণা ছিল মৃত্যুর পর আত্মা সব দেখতে পায়, এই বিশ্বাসে বিশেষ কায়দায় পরিকল্পিতভাবে তাকে ডেকে আনা। এসব অদ্ভুত খেয়ালে তাল মিলাতে গিয়ে আমাদের বন্ধুত্ব আরো বিশ্বাসযোগ্য হয়েছিল। তবে ভবিষ্যৎ জানার জন্য তার রাশিচক্র ও জ্যোতিষবিদ্যার প্রতি ঝোঁক ছিল। সে সময়ে কিরো সহ নামকরা জ্যোতিষির বই সংগ্রহ করে পড়তে পড়তে একসময় নিজেই হস্তরেখা নিয়ে চর্চা শুরু করে। আমরা ছিলাম তার শিষ্য। একটা বিষয়ে মামা হিসাব মিলাতে পারেনি। তন্নতন্ন করে খুঁজেও বিদেশযাত্রার রেখা তার হাতে খুঁজে পায়নি। অথচ বিদেশে লেখাপড়ার ইচ্ছা তার লালিত স্বপ্ন। সব ব্যর্থ করে শুধু পড়াশোনা না জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই তার বিদেশে কেটেছে। সেই বিদেশের মাটিতেই তার স্থান চিরস্থায়ী হল।

স্কুলের শিক্ষাজীবন মূলত ঢাকা গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল থেকে শুরু। এরপর মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ থেকে এসএসসি ও এইচএসসিতে কৃতিত্বপূর্ণ রেজাল্ট করার পর বুয়েটে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ একবছর পড়াশোন করে। পরে হাঙ্গেরীর বুদাপেস্ট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশীপ নিয়ে এমএসসি ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে। তাকে কখনো পিছনে তাকাতে হয়নি। তরতর করে এগিয়ে গেছে তার সফল ক্যারিয়ার। দেশে ফিরে আসার পর প্রথমে বুয়েটে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে জয়েন করে তার শিক্ষকতা জীবন শুরু হয়। ১৯৮৬ সালে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ফাউন্ডিং চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। তার নিষ্ঠা আর অক্লান্ত পরিশ্রমে বিভাগটি এগিয়ে যায়। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং নতুন বিভাগ হওয়া সত্ত্বেও মেধাবী ছাত্রদের ভর্তির জন্য এতো চাপ আসে যে অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাদের জায়গা দিতে হিমশিম খেতে হয়। তার দক্ষতা, পাঠদানের কৌশল, দূরদর্শিতা, নিরলস সাধনা আর সঠিক নেতৃত্বে শত প্রতিকুলতার মাঝেও বিভাগটি দাঁড়িয়ে যায়। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সেখানে কর্মরত থাকার পর অস্ট্রেলিয়ায় মনাশ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করে ৭ বছর। সেখানে পিএইচডি শিক্ষার্থীদের রিসার্চ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে থেকে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডেকোটা স্টেট ইউনির্ভার্সিটিতে ১৯৯৯ সালে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কাজ করে ১ বছর। ২০০০ সালে মিনিসোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে CIS বিভাগে প্রফেসর হিসেবে জয়েন করে। পরে উক্ত বিভাগের নির্বাচিত চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে সেখানেই স্থায়ী হয়। কর্তব্যে নিবেদিত প্রাণ মানুষটি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে গেছে। তার ধ্যান জ্ঞান ছিল কাজ। অসুস্থ অবস্থায়ও তার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। ১৩ এপ্রিল বেশি অসুস্থ হয়ে যাবার পর হাসপাতালে থাকা অবস্থায় ডিনকে অনুরোধ করে যেন সাময়িকভাবে কোন শিক্ষককে ফ্যাকাল্টির চেয়ারের দায়িত্ব দেয়া হয়। সুস্থ হয়ে ফিরে আবার কাজে যোগ দেবে। কিন্তু খুবই দুঃখজনক যে, ১৪ এপ্রিল রাতে ইন্তেকাল করে মহান ব্যক্তিত্ব, দুর্দান্ত ব্রিলিয়ান্ট জাতির সম্পদ ড. সৈয়দ মাহবুবুর রহমান।

বুয়েটে থাকাকালীন ইয়াং এক্সিলেন্ট সায়েন্টিস্ট হিসেবে UNESCO/ROSTSCA-85 পুরস্কার লাভ সহ বহু পুরস্কার ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রযুক্তিক্ষেত্রে তার আবিষ্কার উদ্ভাবন, রিসার্চ, থিসিস গ্রহণযোগ্যতা ও স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। কম্পিউটারের বাংলা ফন্ট এর পরিকল্পনাও তার ছিল। তার

হাতে গড়া দেশ-বিদেশের ইউনির্ভাসিটির অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করছে। সবাই আজও কৃতজ্ঞ চিত্তে পরম শ্রদ্ধার সাথে তার অবদানের কথা স্বীকার করে।

মামার উৎসাহে উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত তার যোগ্য সহধর্মিণী ছোটমামী শরিফুন্নেসা একই ইউনিভার্সিটিতে ইন্সটিটিউশনাল রিসার্চ স্পেশালিস্ট হিসেবে কর্মরত।

একমাত্র ছেলে তাহিন সৈয়দও মামার মত মেধাবী হয়েছে। আব্বু তার জীবনের আদর্শ। অল্প বয়সেই উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বোস্টন এমআইটিতে পড়াশোনা শেষে বর্তমানে আমাজানে ডাটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে কর্মরত।

আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় আবেগতাড়িত হয়ে একটা অনুভূতি প্রকাশ করেছিলাম সাপ্তাহিক বিচিত্রা পত্রিকায়। "আমি মারা গেলে আমাকে নিয়ে কে কী মন্তব্য করে তা জানতে খুব সাধ হয়। তাই কি সম্ভব? তাহলে বেঁচে থাকতে কেন মানুষের মূল্যায়ন হয় না"। এ প্রশ্ন সবার মনে। কিন্তু রীতির কোন পরিবর্তন হয় না। আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি মৃত্যুর পরেই। মামা কি দেখতে পাচ্ছে কতখানি পাহাড় সমান ভালবাসা গড়ে গেছে মানুষের অন্তরে! তার প্রতি কারো কোন অভিযোগ নেই, থাকার কথাও না। এমনই বিশাল ছিল তার সাম্রাজ্য। জীবনে অনেকখানি সময় বিদেশে কাটালেও দেশের জন্য তার মন ব্যাকুল থাকতো। স্বদেশপ্রীতির উদাহরণ তো আমাদের চোখে দেখা। মুক্তিযুদ্ধের সময় নানীর চোখ এড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধা মেজোমামাকে আর তার দলকে কীভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাহায্য করতো সেই অল্প বয়সেই।

দেশে বেড়াতে এলে সারাক্ষণ তার হাতে ক্যামেরা থাকতো। ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের ছবি তোলা, ভিডিও করা তার অন্যতম কাজ ছিল। এ ব্যাপারে তার ধৈর্য্যের কোন অভাব ছিল না। অনেক সময় ব্যয় করে ঘরোয়াভাবে, আড্ডা, খাওয়া-দাওয়া গল্প গুজব, অনুষ্ঠান গেট টুগেদারের ছবি তুলে নিয়ে যেত। প্রবাসী জীবনে এগুলো তার সংরক্ষিত প্রিয় স্মৃতি। আমাদের সাথে কথা বলার সময় এগুলো সামনে রাখত। এখন এসব আমাদের কাছে শুধু স্মৃতি। সবার জন্য এতো মায়া – সব ছেড়ে তাকে একাকী চলে যেতে হলো।

মামী বলতো তোমরা দুই বোন যে তার অন্তরের কোথায় বাস করতে তা আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে। ছোটমামার বিয়ের পর আমাদের আর একজন বন্ধু বাড়লো। সে আমাদের ছোটমামী। মামী কয়েকদিনের মধ্যে বুঝে ফেললো ছোট মামার পছন্দ-অপছন্দ, ভালো লাগা-মন্দ লাগা। তাই তার মত করে আমাদের সাথে মিশে যেতে তার সময় লাগেনি।

২০১৬ সালে মামা-মামী ও তাহিন সহ আমরা কয়েকজন নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি রাঙামাটি ভ্রমণে গিয়েছিলাম। কাপ্তাই হ্রদের পাশে পাহাড়ী পরিবেশে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত নান্দনিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিমছাম ছায়াঘেরা পরিবেশের রিসোর্ট 'আরণ্যক'-এ অবস্থান করি।

সেই চারদিন টেনশানমুক্ত ফুরফুরে মেজাজে হৈহুল্লোড়-আড্ডা-গল্প-গান গাওয়া-ছবি তোলা -প্রকৃতির নয়নাভিরাম মোহনীয় সৌন্দর্য উপভোগ করা-বেড়ানো সব মিলিয়ে এক দারুণ সময় কাটানো। ইঞ্জিনচালিত বোটে কাপ্তাই লেক ধরে শুভলং ঝর্ণা দেখতে যাওয়া-আসার সময় পাহাড়ের মাঝে বিমোহিতকারী সৌন্দর্যে মামার সাথে গলা মিলিয়ে গান গাওয়া ছোট বেলার দিনগুলোর কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছিল। সেবার ভ্রমণে বাড়তি আনন্দ ছিল থার্টিফার্স্ট নাইটে সেনা সদস্যদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে অংশ নেয়া। জোছনা রাতে মায়াবী পরিবেশে সে রাত ছিল খুবই উপভোগ্য। আয়োজকরা মামাকে স্টেজে তুলে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং উপহার সামগ্রী দিয়ে তাকে সম্মানিত করে। আমরা মামার সম্মানে গর্ব অনুভব করেছি। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ফেরার পথে পরবর্তী ট্যুর কোথায় কোথায় হবে তার ছকও কাটা হয়ে গিয়েছিল। সব মিলিয়ে ছোট মামাদের সান্নিধ্যে দারুণ কেটেছিল। তখন কি জানতাম ছোটমামার সাথে ওটাই ছিল শেষ জার্নি।

আমার আব্বা, বিচারপতি মো. আবদুল জলিল, বয়সে ছোট হলেও বড়মামাকে যেমন প্রধান পরামর্শদাতা মানতেন, অন্য মামাদের প্রতিও ছিল তার অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতা। আমরা সে বিশ্বাস নিয়ে বড় হয়েছি। ছোটমামাকে তিনি নিজের আর এক সন্তান মনে করতেন। ২০০৭ সালে মৃত্যুর একদিন আগে আব্বা, আমার ছোট ভাই আশিককে কাছে পেয়ে একান্তে মনের কিছু কথা বলেছিলেন। যে কথাটা খুব স্পর্শকাতর ছিল তা হচ্ছে, "তোমাদের নিয়ে আমি চিন্তা করিনা, নিশ্চিন্তে রেখে যাচ্ছি, কারণ তোমরা মামাদের মত

সৎ, নির্লোভ, নির্মোহ হয়েছ। তোমার মামারা তোমাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। তাদের হাত কখনো ছেড়োনা।"

মৃত্যুর কদিন আগেও ভিডিও কল করে ঘন্টার পর ঘন্টা বিশাল পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের সাথে নাম ধরে ডেকে ডেকে চেহারা দেখে কথা বলেছে। প্রায় প্রতিবছর মামী ও তাহিনকে নিয়ে দেশে আসার চেষ্টা করতো। বড়মামার নির্দেশে তার বাসাতেই উঠতে হতো। পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনেক বেড়েছে। কিন্তু বড়মামা আর মামী মহীরূহের মত তাদের ছায়াতলে সবাইকে এক করে ধরে রেখেছেন। ছোটমামাদের কেন্দ্র করে আমাদের চাঁদের হাট বসতো। তারা যে কটা দিন থাকতো – এয়ারপোর্টে রিসিভ করা থেকে শুরু করে সে কদিন থাকতো আমাদের ঈদ উৎসব।

প্রায় চার পাঁচশ সদস্যের উপস্থিতিতে প্রতি বছর ২৫ ডিসেম্বর বড় মামা-মামীর নেতৃত্বে পারিবারিক মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। পর পর দুবার ছোট মামারা এতে অংশগ্রহণ করায় আমাদের আনন্দ আরো বহুগুণিত হয়ে যায়। মামা আর তাহিন একরকম পাঞ্জাবি পরে এসেছিল অনুষ্ঠানে। সবাই মিলে ছোটমামাকে স্টেজে গান গাইতে উদ্বুদ্ধ করেছিলাম। খুব সাগ্রহে গেয়েছিল। ওরে নীল দরিয়া...। সব বয়সের সদস্যরা স্টেজে উঠে মামার সাথে উল্লসিত হয়ে সুর মিলিয়েছে। এত উঁচুমাপের একজন মানুষ তার সহজাত স্বভাব দিয়ে, আন্তরিকতা দিয়ে মানুষকে আপন করে নিয়েছিল।

পরের বারের মিলন মেলায় – মোবাইলে সেভ করে এনে একটা স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে ছিল– 'আমি এক যাযাবর ---' কবিতার ভিতরে তার জীবনকাহিনীর সাথে একটা অন্তর্নিহিত ভাব ছিল যা সবার হৃদয় স্পর্শ করেছিল। আমি অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলাম। আমি মামার সাথে মামী এবং তাহিনকে মঞ্চে আসার জন্য আহবান করেছিলাম। তাহিন মামার মতই বিনয়ী আর নম্র। ও উঠতে ইতস্তত করছিল, 'আরো অনেক ছেলে মেয়েই তো দেশের বাইরে থেকে এসেছে। আমাকে কেন ডাকা হলো।

তখন আমি এবং মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত সদস্যরা বললেন, তোমাকে ডাকার কারণ তোমার আব্বু। কারণ আমাদের ফ্যামিলিতে তার মর্যাদা অনেক উপরে। তাই তোমার আব্বুর সম্মান রক্ষার্থে তোমাকে ডাকা। তাহিন জন্মের পর থেকে দেশে-বিদেশে, কাজের জায়গায় সেমিনার সিম্পোজিয়ামে, সম্মাননা প্রাপ্তিতে ওর আব্বুর গুরুত্ব দেখে এসেছে,

তাই ও মৃদু হাসলো। সে হাসিতে পরিতৃপ্তি ছিল। কবিতা পাঠ শেষে মামী বললো, আমি ওর যাযাবর জীবনের সাথী। এ পর্যন্ত আমাদের জীবন ভালোই কেটেছে । বাকী জীবন কেমন যাবে জানিনা।

মামা-মামী মিনিসোটায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাড়ি কিনে নিয়েছিল। সামনে ফুলের বাগান। সামারে অজস্র দর্শনীয় ফুল বাড়ির শোভা বাড়াত। পিছনে সবজী আর ফল বাগান। কাঁচা সবজি ফল অনেক আসতো এই বাগান থেকে। ভিডিও ক্যামেরায় ঘরের ভিতরে, বাইরে আমাদের দেখাতো। আসলে এ উপায়ে আমাদের সাথে থাকা। মনে হতো এইতো সামনেই আছে। তাদের সংসারকে আমরা টোনাটুনির সংসার বলতাম। শীতে গাছপালা, বাড়িঘর সব বরফে আচ্ছাদিত থাকতো। তখন হিটারের বিশেষ ব্যবস্থা থাকতো। জীবন চলে যেতো। মিনিসোটা ইউনিভার্সিটি তাদের বাসা থেকে ওয়াকিং ডিসটেন্স। তাই পুরনো হলেও এই বাড়িটা কেনার ব্যাপারে মামার আগ্রহই বেশি ছিল।

ছোট মামার নিজের লেখা 'আমি এক যাযাবর' কবিতার অংশবিশেষ এরকম:

আমি এক যাযাবর, ভুলেছি নিজের ঘর।
শান্তি শুধু এই মনে হয় যে
পৃথিবী আমাকে করেছে আপন।
তবু আমি যাযাবর, আমি এক যাযাবর।
আমি গঙ্গার থেকে দানিয়ুর হয়ে বুদাপোস্টে গিয়ে থেকেছি।
পেরুগুয়ে, প্যারিস, বার্লিন লন্ডন আরো কত শহরের রূপ দেখেছি।
মক্কা মদিনা গিয়ে তার ধুলো মেখেছি।

শেষ লাইনগুলো ছিল–

আমি দেখেছি অনেক গগনচুম্বী অট্টালিকার সারি
তাই এখন ম্যানকাটোতে এসে
মনে হয় গড়েছি শেষ বাড়ি।

শেষ লাইনটা যেন চরম সত্যি হয়ে গেল। 'গড়েছি শেষ বাড়ি'– এই বিদেশের মাটিতেই হলো তার শেষ আশ্রয়।

তাহিন এযুগের ছেলে। তথ্য প্রযুক্তির আধুনিক ব্যবহার তার সব জানা। বোস্টনে বসেও বাবা মায়ের সার্বক্ষণিক মনিটর করতো। মামাদের ওয়েট বেড়ে যাচ্ছিল বলে খুব চিন্তিত ছিল। রেগুলার কত স্টেপ হাঁটে, ওয়েট কমানোর জন্য হেলদি কিন্তু কম খাওয়ার পরামর্শ দিত। রুটিন মাফিক হাঁটছে কিনা, নিয়মমতো খাওয়া দাওয়া করছে কিনা, ওষুধ খাচ্ছে

কিনা, ব্লাড প্রেসার, ডায়বেটিসের পরিমাপ সব তার আয়ত্তে। অনিয়ম দেখলে কড়া শাসন। ওর তদারকির ভয়ে দুজনকে নিয়ম করে চলতে হতো। এর মধ্যে কী করে কী হয়ে গেল, সুস্থ মানুষ কয়েকদিনের মধ্যে শেষ হয়ে গেল।

ছোটমামা এসেছে এই উপলক্ষে বড়মামার বাসায় থাকবো আমরা সবাই অর্থাৎ আমাদের ছয় ভাইবোনের পরিবার সাথে মেজোমামার পরিবার। সে আয়োজন তারা আগেই করে রেখেছেন। বড় বড় মশারি, তোষক, বালিশ কোন কিছুর অভাব নেই। থার্টি-ফার্স্ট নাইটে ছাঁদে ফানুস উড়ানো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্পেশাল খাওয়া-দাওয়া চলছে। রাতের শেষ অংশে ঘরে বসে চলেছে আড্ডা – প্রতিভা বিকাশের প্রতিযোগিতা। সবচেয়ে উপভোগ্য ছিল ছেলে বনাম মেয়েদের দলের অন্তাক্ষরী খেলা। এতবড় উদ্ভাবক, গবেষক, মানুষ গড়ার কারিগর পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সময় ছেলেমানুষ হয়ে যেত। ছেলেদের দল জয়ী হয়েছিল কারণ রাজিক এবং মামার স্টকে প্রচুর গান ছিল। যাবার সময় বলে গিয়েছিল এর পরেরবার আরও গানের লাইন শিখে আসবে ইউটিউব দেখে। করোনার জন্য আসা বিলম্ব হয়েছিল। বড়মামা কিছুদিন আগেও বলেছিলেন, এর পরেরবার মাহবুবরা এলে সবাই মিলে কক্সবাজার যাব। মনে হলে বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠে। মাহবুব মামাকেন্দ্রিক আনন্দ-অনুষ্ঠান চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।

এর মধ্যে ভিডিওতে কথা হয়েছে। দুজনে চোখের সামনে কাজ করছে, কথা বলছে। মামী রান্না করে এনে টেবিলে রাখছে। মামা ঢাকনা খুলে টেস্ট করে আমাদের দেখাচ্ছে, কি কি আইটেম আজ হয়েছে। মনে হয় কাছেই আছে। শুধু একটা দেয়াল।

হঠাৎ মামী লিখে জানাল তোমার মামা অসুস্থ্য বোধ করছে হাসপাতাল যেতে চাচ্ছেনা। তোমরা বল যেতে। মামার বক্তব্য ছিল, হাসপাতালে তোমরা কি আমাকে মারার জন্য নিতে চাও? ওখানে গেলে আমি আর ফিরব না। কি জানি কেন ছিল এই আতংক। ভিতর থেকে হয়তো আগেই কিছু আঁচ করতে পেরেছিল। খবর পেয়ে তাহিন এলো। জোর করে নিয়ে যাওয়া হলো। পায়ে নাকি ব্লাড ক্লট হয়েছে এর আগে দ্রুত অপারেশনও হয়েছে। এবার আইসিইউতে থাকলেও অবস্থা উন্নতির দিকে ছিল। তাহিন নিজের হাতে মামাকে স্যুপ খাওয়াতে খাওয়াতে বাসায় ফিরে যাবার পরিকল্পনা করছিল – বাসায় ফেরার আগে কিছুদিন হাসপাতালের কাছে থাকবে চেক আপের সুবিধার জন্য। কোথায় কোথায় তিনজন মিলে বেড়াতে যাবে তারও প্ল্যান করছিল। তার পর বাসা ক্লিন করে তিনজন

ফিরে যাবে। মামী পাশে বসে দোয়া দরুদ পড়ে যাচ্ছিল। মামা বলল – 'আচ্ছা বেশ যাব।'

ডিউটি নার্স এসে ক্লিন করার জন্য করতে নাড়াচাড়া করাতে হঠাৎ অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। ডাক্তাররা ছুটে এলেন। সিমটম বুঝতে পেরে উনারা তাহিন ও মামীকে বাইরে যেতে অনুরোধ করে বললেন। লাইফ সাপোর্ট দিতে হবে, আপনারা সহ্য করতে পারবেন না। তাহিন মামার হাত চেপে ধরে বলল, আমি তোমায় ভালবাসি আব্বু। মামাও তাহিনের দুহাত চেপে ধরেছিল। দুজনের চোখ বেয়ে টপটপ করে পানি ঝরছে। বাকরুদ্ধ মামী।

এসব পরে মামীর কাছ থেকে শোনা। কে কাকে সান্ত্বনা দেবে। বিদেশ বিভূঁই-এ পরিজন ছাড়া অসহায় দুজন মানুষ। কাঁচের দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে সব শেষ। উন্নত দেশের উন্নত চিকিৎসা সব ব্যর্থ করে দিয়ে প্রিয় মানুষদের কাঁদিয়ে সব শূন্য করে দিয়ে দেশ-বিদেশের এক মূল্যবান সম্পদ অসময়ে চলে গেল। মিনিসোটার মায়ো হাসপাতালে আমাদের পরিবারের সাজানো বাগানের সবচেয়ে প্রিয় ফুলটি অকালে ঝরে গেল।

মৃত্যুর আগে আগে জানা গিয়েছিল মামার AML (Acute myeloid Leukemia) হয়েছিল। যা হঠাৎই ধরা পড়ে, নিয়েও যায় তাড়াতাড়ি। কেমো দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছিল। তাতে হয়তো কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারতো। কিন্তু মামা সে সময়টা আর পেল না। মানুষের জীবন এমন এক পর্যায়ে চলে যায় সেখান থেকে জীবন আর ফিরে আসে না।

মামী তার বুকের চাপা কান্না হালকা করতে আমাদের মামার প্রিয় কর্মস্থান টেবিল ভিডিওতে দেখায়, সেখানে স্তূপীকৃত মামার রিসার্চের সব কাগজপত্র, ফাইলসহ প্রয়োজনীয় জিনিস, ল্যাপটপ, লকডাউনে অনলাইনে ইউনিভার্সিটির কাজের আনুসঙ্গিক উপাত্ত। হাসপাতাল যাবার আগে পর্যন্ত এই প্রিয় টেবিল আর রিভলভিং চেয়ারে বসে কাজ করে গেছে যা এখনও অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। সেই শূন্য চেয়ার আর টেবিল দেখাতে গিয়ে মামী কান্নায় ভেঙে পড়ে আর সাথে আমরাও। এখানে বসে আমাদের সাথে কত দিনরাত ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে গেছে, কথা যেন আর শেষ হতো না।

এই শূন্য ঘর, আর ব্যবহার্য জিনিসপত্র, আর ভাঙ্গা সংসার আমার ছোটমামার! মামী আর তাহিন স্মৃতি হাতড়ে বেড়ায়। ওদের হাহাকার আমরা অনুভব করি দূর থেকে। কী সান্ত্বনা দেব--
তাই,
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।

মামী ছোটমামার কাজের টেবিল থেকে একটা চিরকুট পেয়ে আমাদের দেখাল। ওতে কয়েকটা গানের লাইন লেখা আছে–

১. হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস দম ফুরাইলে ঠুস
২. এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়, একি বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু
৩. আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব

হয়তো অবচেতন মনে এগুলো লিখেছিল।

এইতো নিয়তি। মন না মানলেও সত্যকে মেনে নিতে হবে। এখানে মানুষ অসহায়। জীবন মরণ সব সৃষ্টিকর্তার হাতে। মানুষের সাধ্য কী ধরে রাখার।

এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।

কোনো মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে না। মামার অজান্তে কোন ভুল হয়ে থাকলে আমরা যেন তাকে ক্ষমা করে দেই। মহান আল্লাহ বেহেশতের শ্রেষ্ঠতম স্থান তার জন্য নির্ধারিত করুন। আমিন।